সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারী ও যৌনতা : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অভিজিৎ রায়

(সাতরং ওয়েব সাইটের জন্য লিখিত)

আমার এই প্রবন্ধটি উৎসর্গীকৃত হচ্ছে সেই সব নারীবাদী আর মানবতাবাদীদের উদ্দেশ্য যারা সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত কানাডায় শারিয়ার আগ্রাসন ঠেকিয়েছেন।

'নারী শোষণে বুর্জোয়া আর সর্বহারায় কোন পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেনীটিকে শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণীর নারীটিকেও; আর সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে তার নিজের শ্রেণীর নারীকে। বিত্তবান শ্রেণীর নারী পরগাছার পরগাছা, বিত্তহীন শ্রেণীর নারী দাসের দাসী। শোষণে সব শ্রেণীর পুরুষ অভিন্ন, শোষণে মিল রয়েছে মার্কিন কোটিপতির সাথে বিকলাংগ বাঙালি ভিখারীর, তারা উভয়েই পুরুষ, মানবপ্রজাতির রত্ন। আর নারীমাত্রই দ্বিগুন শোষিত।' — হুমায়ুন আজাদ

শকুনির মামার সাথে পাশা খেলে সর্বস্ব খোয়ালেন 'ধর্মপুত্র' যুধিষ্ঠির। সহায়-সম্পত্তি, জমি-জমা, টাকা-পয়সা সব কিছুই গেল। কৌরবদের চোখ পড়ল তখন পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদির দিকে। শকুনি বললেন, 'তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী তো এখনো পরাজিত হয়নি, তুমি তাকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করো।' যুধিষ্ঠির অগত্যা দ্রৌপদিকেই পণ রাখলেন। বাজির নিয়মানুসারে বাজি ধরা পণ্যের মূল্যমান বা গুনাগুন প্রকাশ্যে ঘোষনা করতে হয়। কাজেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তার স্ত্রী দ্রৌপদীর রূপ-গুনের ঘোষণা করলেন প্রকাশ্যে, সভামধ্যে :

> ''হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃষা, নাতিস্থূলা, যাহার রূপ লক্ষীর ন্যায়, কেশকলাপ দীর্ঘ নীল ও আকুঞ্চিত; নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ, হস্তে সর্বদা শারদপদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূততা প্রভৃতি ভর্তার অভিলষিত গুণসমূহে বিভূষিতা; তিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাহার সস্বেদ মুখপঙ্কক মল্লিকার ন্যায়, মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্বাংগসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।'' {-মহাভারত, সভাপর্ব, ৬৩ অধ্যায়}

নিজের স্ত্রীর এই আকর্ষনীয় দেহবল্লরীর সেক্সগন্ধী বিবরণ তার স্বামী যুধিষ্ঠির সভামধ্যে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সহজভাবে। যুধিষ্ঠিরের বর্ণনায় উঠে আসা নারী-দেহবল্লরীর বর্ণনা আসলে চিরন্তন পুরুষতান্ত্রিক বর্ণনা, নারী সৌন্দর্যকে এভাবেই পুরুষ বন্দনা করেছে, কিংবা করতে চেয়েছে যুগে যুগে। নারীর পিনোন্নত স্তন, গুরুভার নিতম্ব, ক্ষীণ কটিদেশ নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে কাব্য করেছে পুরুষ; বানিয়েছে নানা পদের সাহিত্য, কখনও নিয়ে এসেছে শিল্পকলায়।

আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেখি মহাভারত থেকে। অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্দবেশী পান্ডবেরা দ্রৌপদীসহ বিরাটভবনে আশ্রয় গ্রহন করলে, মৎসরাজ বীরাটের শ্যালক ও প্রধাণ সেনাপতি কীচক ছদ্দবেশী দ্রৌপদীর (সৈরন্ধ্রী) রূপে মুগ্ধ হয়ে সরাসরি দেহমিলনের প্রস্তাব দেয়। কামার্ত কীচকের কন্ঠে দ্রৌপদীর দেহের রূপ উঠে আসে এভাবে :

> ‘বলীবিভঙ্গচতুর, স্তনভারাবনত, করাগ্রসম্মিত মধ্যভাগ ও নদীপুলিনসন্নিভ মনোহর জঘনস্থল নয়নগোচর করিয়া আমি দুর্ণিবার্য কামজ্বরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি ...’ {-মহাভারত, বিরাটপর্ব, ১৪ অধ্যায়}

বর্ণনা পড়ে বোঝাই যাচ্ছে যে, কীচকের প্রধান আকর্ষণ দ্রৌপদীর দেহের মধ্যভাগ যা তার বর্ণনাতেই- ‘স্তনভারে আনত’। শুধু তাই নয়, এটি আবার ‘করাগ্রসম্মিত’; যা বোঝাছে কোমরের মাপকে। ‘নদীপুলিনসন্নিভ মনোহর জঘনস্থল’ - এই বর্ণনার মাধ্যমে কীচক কী বোঝাতে চাইছে তা বলাই বাহুল্য। নদীর সাথে কেন তুলনা করা হয়েছে সে ব্যাখ্যা পাঠককে মনে হয় না দিলেও চলবে।

মহাভারত ছেড়ে এবার একটু রামায়নের দিকে চোখ ফেরাই। ওখানেও কিন্তু সেই পুরোন কাসুন্দিই। রাবণ এসেছিলেন সীতাকে অপহরণ করতে পরিব্রাজক বেশে। সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে হয়ে রাবণ বলে উঠলেন :

> ‘হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্যধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। ... তোমার দন্তসকল সমচিক্কণ, পান্ডুবর্ণ ও সূক্ষাগ্র, নেত্র নির্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত, তোমার নিতম্ব মাংশল ও বিশাল, উরু করিশুন্ডাকার, এবং স্তনদ্বয় -উচ্চ, সংশ্লিস্ট, বর্তুল, কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থুল, উহা উৎকৃস্ট রত্নে অলঙ্কৃত, এবং যেন আলিঙ্গ নার্থ উদ্যত রহিয়াছে। ...’ {রামায়ন, আরণ্যকান্ড, ৪৬ সর্গ}

বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে এবারো বিরত রইলাম। সীতার *তালপ্রমাণ স্তনদ্বয় আলিঙ্গনার্থ উদ্যত* - এ বাক্যের আবেদন খুবই স্পষ্ট। আসলে এগুলো সবই হল পুরুষের মুখে নারীর রূপের বিচিত্র বর্ণন, যা যুগ যুগ ধরে আমরা যা দেখে আসছি, শুনে আসছি! এবার একটু বিপরীতটি খোঁজার চেষ্টা করি। সাহিত্যে নারীর চোখে পুরুষের দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনাটি কেমন? এখানে এসেই কিন্তু দমাস করে ধাক্কা খেতে হবে আমাদের। পুরুষেরা যেভাবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে নারীদেহের বর্ণনা দিয়েছে গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, গানে তার সিকিভাগের একভাগও কি উঠে এসেছে উল্টোভাবে? মানে, পুরুষেরা যেভাবে অনাদিকাল থেকেই সহজভাবে একটি নারীর স্তন, নিতম্ব, কটিদেশের বর্ণনা দিতে পেরেছে, সেভাবে কি পাওয়া গিয়েছে নারীর মুখ থেকে পুরুষের দেহ আর বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা? একদমই না। আমরা উপরের উদাহরনেই দেখেছি রাবণ সীতাকে দেখে তাঁর দেহের অংগপ্রত্যঙ্গের কি নিপুন বর্ণনা দিয়েছে, অথচ, ঠিক একইভাবে সুপুরুষ রামকে দেখে শূপর্নখা যখন কামমোহিত হল, তখন শুধু বলল - ‘রাম তুমি সুন্দর পুরুষ, তোমাকে দেখে আমি কামজ্বরে জর্জরিত।’ রামের কোন বিশেষ দেহসৌষ্ঠব, বা অংগপ্রত্যঙ্গ বা উপাঙ্গ দেখে শূপর্নখা কামার্ত হয়েছিল কিনা তাঁর বিন্দুমাত্র উল্লেখ এতে নেই।

ঠিক একই ভাবে বলা যায়, কীচক কামার্ত হয়ে দ্রৌপদীর রূপের কত উত্তেজক বর্ণনাই না দিয়েছে, তাঁর স্তন, জঘনস্থল সবকিছুই তাকে কীভাবে আকৃস্ট করেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছে কীচক। এবার অন্যদিকটি আরেকবার দেখার চেষ্টা করি। যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে বারো বছর বনবাসে ছিলেন অর্জুন। সে সময় একদিন অর্জুন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে নাগ রাজকন্যা উলূপী কামকাতুরা হয়ে তাঁকে আকর্ষণ করে পাতালে নাগভবনে নিয়ে যান, আর অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করেন। কিন্তু এই আত্মনিবেদনে

কোন শরীরী বর্ণনা প্রকাশ পায়নি! শূপর্নখার মতই ঊলূপীও শরীরী বর্ণনা এড়িয়ে শুধু তার ‘নারীসুলভ’ ‘অশরীরী’ কামনাকে তুলে ধরেছে এভাবে :

> ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরন্য অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।’ -{মহাভারত, আদিপর্ব, ২১৪ অধ্যায়}

এ ধরণের উদাহরণ হাজির করা যায় অজস্র! ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের তিনসর্গ জুড়ে পার্বতীর দেহের বর্ণনা রয়েছে। শিবঠাকুর পার্বতীর দেহের কোন কোন স্থান দেখে ‘আসঙ্গলিপ্সু’ হয়েছে তার নিঁখুত বর্ণনা দেওয়া আছে ওতে। কিন্তু উলটোভাবে শিবের দেহসৌষ্ঠবের কোন সুচারু বর্ণনা চোখে পড়ে না।

আসলে এ কথা বোধ হয় মেনে নেবার সময় এসেছে যে, শুধু আমাদের সংস্কৃতিতে নয়, শিল্প সাহিত্যে আর এমনকি শিল্পকলাতেও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ পুরুষ কর্তৃক নারীদেহের রসালো বর্ণনায় আর তাদের মনোজগতের কল্পনায়। এ বর্ণনা আর কল্পনা উভয়েই শুধুমাত্র পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীজাত আর সেভাবেই সুদূর অতীত থেকে এ কালে এসে পৌছেছে বংশ-পরম্পরায়। নারীদেহের ‘শৈল্পিক রূপায়ন’ বহুক্ষেত্রেই বিকশিত হয়েছে শুধুমাত্র পুরুষের যৌন-অভিরুচিকে প্রাধান্য দিয়ে। প্রাচীন ভারতের শিল্পসাহিত্যের পুরোধাদের সকলেই ছিলেন পুরুষ - শুক্রাচার্য, বাৎসায়ন, ভারত মুনি প্রমুখ। তারাই সৃষ্টি করেছিলেন প্রথার, পরিস্কার করে বললে বলতে হয়, একটি ‘কু-প্রথার’ - যে প্রথা দেহের শৈল্পিক রূপায়ন বলতে শিখেয়েছে শুধু পৃথুল স্তন, ক্ষীণ কটিদেশ আর সুবিস্তৃত নিতম্বকে!

ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু শুধু গালাগাল দিয়েই বা কি লাভ! পাশ্চাত্য সভ্যতাও তো কম যায় না একেবারে। সেই *রুবেনসের* নধর সুন্দরীদের দৈহিক উচ্ছলতাই ধরুন কিংবা ধরুন *মোদিগ্লিয়ানির* নগ্নিকার কথাই ধরুন - সব জায়গাতেই সেই একই রূপ। কী শিল্পে আর কী সাহিত্যে নারীদেহের বিচিত্র উপস্থাপন একটি ‘স্ট্যান্ডার্ডে’ পৌঁছিয়ে গিয়েছে, তৈরী হয়েছে পুরুষ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া একটি ছক, যা থেকে রেরুতে পারেননি এমনকি নারী চিত্রশিল্পীরা কিংবা স্থাপত্যশিল্পীরাও। একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক বিখ্যাত নারী চিত্রকরের ছবির প্রদর্শনীতে গিয়ে সেই চিত্রকরের আঁকা অসংখ্য নগ্নিকার ছবি দেখে কৌতুহলী সুনীল চিত্রশিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন - ‘আচ্ছা, নারীদেহের এই চিত্র-বিচিত্র বর্ণনা পুরুষেরা তো যুগে যুগে দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। তোমরা এর বিপরীতটা দেখাচ্ছ না কেন? পুরুষদের নগ্নদেহ তোমরা শিল্পে তুলে ধরছ না কেন?’ উত্তরে চিত্রশিল্পীটি জানালেন, নারীদেহের বাঁক সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলাই নাকি চিত্রকলার ‘স্ট্যান্ডার্ড’! এই স্ট্যান্ডার্ডে ভেসে গিয়েছিলেন সয়ং রবীন্দ্রনাথও। নগ্ন নারীদেহ নিয়ে তাঁর খোলামেলা মতামত আমরা পাই *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরীতে*। সেবার প্যারিস একজিবিশনের দ্বিতীয় সংস্করণে ফরাসী শিল্পী কারোল্যু-দ্যুরাঁর আঁকা নগ্নিকা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলে উঠেছেন :

> ‘চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। কি আশ্চর্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি। কিন্তু মর্ত্তের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখলে চেতনা হয় পশুমানুষ বিধাতার স্বহস্ত রচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে রেখেছে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদঘাটন করে সেই দিব্যসৌন্দর্যের আভাস দিলে।’

এরপর গঙ্গা-যমুনার উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কেটে গেছে অনেক কাল, দীর্ঘ সময়। অনেক অনেকদিন পর এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত সনাতন 'স্ট্যান্ডার্ডের' বুকে চাবুক কষলেন একজন সাদামাঠা আটপৌরে বাঙালী রমণী, নাম তসলিমা নাসরিন। তিনি বললেন :

> 'আমরা নারীরা পুরুষের সুঠাম শরীর দেখতে চাই চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে। আমরা আমোদিত হতে চাই পুরুষ শরীর দেখে। আমরা তৃষ্ণার্ত হতে চাই, আহ্লাদিত হতে চাই' (নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য)

বাংলাদেশে সম্ভবত প্রথমবারের মত একটি মেয়ে প্রথা ভেঙে 'নষ্ট হওয়া'র পক্ষে সাফাই গাইলেন এভাবে, বাংলাভাষায় প্রথমবারের মত :

> 'নিজেকে সমাজের চোখে নষ্ট বলতে আমি ভালবাসি। ... যে মেয়ে একটি সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র ধারণ করে এ সমাজ তাকে বলে নষ্ট। এ সমাজে নারীর শুদ্ধ হবার প্রথম শর্ত নষ্ট হওয়া ।'

এ এক অভাবনীয় উচ্চারণ। কোন বাঙালী এর আগে এতো স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে 'ভদ্দরনোকের' গড়ে তোলা দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙেনি। মূঢ় লোলচর্ম প্রথাবাদীরা স্বভাবতই তসলিমার উপর ক্ষেপে উঠবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। যেমনিভাবে একটা সময় পাশ্চাত্যের ভিকটোরিয়ান মন মানসিকতার 'ভদ্র-পুরুষেরা' ক্ষেপে উঠেছিলেন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের (১৭৫৯-১৭৯৭) বিরুদ্ধে। ১৭৯১ সালে এই বত্রিশ বছর বয়সী তসলিমার মতই সাধারণ এক তরুণী ওলস্টোনক্র্যাফট মাত্র ছ-সপ্তাহে লিখেছিলেন *ভিন্ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন* নামক এক ভয়ঙ্কর বই। সে বই ছিল সম্ভবত ফরাসী বিপ্লবের চেয়েও বেশী বিপ্লবাত্মক। এই এক বই লিখেই রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের কাছে হয়ে উঠেন এক ঘৃন্য নাম, যে ঘৃনার ক্রমাগত উদগীরন ঘটেছিলো বইটি বেরুবার দুশ বছর ধরে পুরুষতান্ত্রিক 'পবিত্র' মুখ দিয়ে। জীবদ্দশায় মেরি কোন স্বীকৃতি পাননি, পেয়েছেন কুৎসা, ঘৃণা আর পুরুষতান্ত্রিক গালিগালাজ। কারণ এই বইয়ের মাধ্যমেই প্রথমবারের মত একজন নারী পুরুষতন্ত্রের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েদিয়েছিল তাদের হিপোক্রিসিগুলো, সমাজের অসঙ্গতিগুলো। এই প্রথম একজন নারী দাবী নিয়ে এলেন যে, নারী মানুষ, নারী কোন যৌনপ্রাণী নয়, তাকে দিতে হবে স্বাধীকার (রেফারেনস : নারী, হুমায়ুন আজাদ)। আমাদের মনে রাখতে হবে মেরি এমন একটা সময় এই বইটি লিখছিলেন যখন নারীদের ভোটাধিকার ছিলো না, ক্রীতদাস প্রথা বলবৎ ছিল পুরোমাত্রায়। মেয়েদের দেখা হত 'অনিচ্ছুক প্রসবযন্ত্র' আর 'গৃহদাসী' হিসেবে। আঠারো শতকের গোড়ায় পুংগর্বী পুরুষেরা দেশে দেশে ঔপনিবশিক শক্তির আস্ফালনে উন্মত্ত, শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় গর্বিত, তখন এক সাধারণ নারী হৃদয়ের দাবীতে উদ্বেলিত হয়ে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে একটি বইয়ের মাধ্যমে চীৎকার করে ঘোষনা করলেন নারীমুক্তির প্রথম ইশতেহার। ডঃ হুমায়ুন আজাদের ভাষায় - 'এ বই সাথে সাথে কোন বিপ্লব ঘটায়নি, তবে সূচনা করে এক দীর্ঘ বিপ্লবের, যা আজো অসম্পুর্ণ।'

এই প্রথম কোন পরিচয়হীন সাধারণ এক নারী প্রথিতযশাঃ রুশো, রাসকিন, গ্রেগরিদের 'ভালোমানুষী মূর্তি' ভেঙ্গে প্রদীপ্ত কন্ঠে বললেন :

> 'আমাকে দুর্বিনীত বলতে পারেন; তবু আমি যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তা আমাকে বলতে হবে যে রুশো থেকে ডঃ গ্রেগরি পর্যন্ত যাঁরা নারীশিক্ষা ও ভদ্রতা সম্বন্ধে লিখেছেন, তারা সবাই নারীকে সাহায্য করেছেন আরো কৃত্রিম, দুর্বল চরিত্রের হয়ে উঠতে, এবং পরিণামে তাদের ক'রে তুলেছেন সমাজের আরো বেশি অপদার্থ সদস্য'।

স্বাভাবিকভাবেই পুরুষতন্ত্র মেরির এধরণের স্পষ্টভাষণ মেনে নিতে পারেনি। তাকে আক্রমণ করা হয়েছে ‘বেশ্যা’, ‘নষ্টা’, ‘কুলটা’, ‘ডাইনী’ -এধরণের নানা অভিধায় অভিহিত করে। শুধু পুরুষতন্ত্রই নয়, কিছুদিন আগ পর্যন্ত এমনকি পাশ্চাত্য নারীবাদীরাও সংকোচ বোধ করত মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের নাম নিতে, ভয়ে কুঁকরে যেত একথা ভেবে যে মেরির নাম নিলে এক ধরনের ‘লেবেল’ এঁটে দেয়া হবে গায়ে, ঠিক যেমনটি বাংলাদেশের নারীবাদীরা তসলিমার নামটি মুখে নিতে চায় না আজ। শিবনারায়ন রায় কলকাতার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তার *বন্য গোলাপের সৌন্দর্য* নামের একটি প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় রায় দিয়েছেন যে, সমকালীন দুই বাংলা মিলিয়ে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের যোগ্যতমা উত্তরসাধিকা হচ্ছেন স্বদেশ থেকে নির্বাসিতা তসলিমা নাসরিন। এতোদিন ধরে তসলিমাকে শুধু মৌলবাদীরাই গালিগালাজ করত, ক (দ্বিখন্ডিত) বেরুবার পর তাদের কাতারে সামিল হয়েছে ‘প্রগতিশীলতা’র লেবাসধারী পুরুষতন্ত্রও। প্রগতিশীলতার নিপাট ভদ্রলোকি চেহারা ফুটে উঠেছে সমরেশ মজুমদারের একটি উক্তিতেই :

> ‘সোনাগাছির সন্ধ্যারাণীরা এ কাজটি যত পেশাদারী যোগ্যতা নিয়ে করতে পারেন বাঙালি লেখিকা দেশী-বিদেশী যত চাঁদরেই তার নিশিযাপন হোক না কেন, সে কাজ পারবেন বলে মনে হয় না।’

এধরনের বক্তব্য সুনীল, হুমায়ুন আজাদ কিংবা শীর্ষেন্দুর মুখ থেকেও পাওয়া গেছে। যৌন-স্বাধীন, অবাধ্য নারীকে ‘বেশ্যা’ বলা পুরুষতন্ত্রের পুরোন কৌশল। যেন ‘বেশ্যা’ নামে অভিহিত করতে পারলে এক লহমায় প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। বিগত বি.এন.পি সরকারের শাসনামলে দিনাজপুরে ইয়াসমিন নামের একটি মেয়েকে ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছিল। এ নিয়ে সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিলো তোলপার। বেগতিক দেখে হত্যায় মূল ভূমিকা পালনকারী পুলিশেরা অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলো এ কথা প্রচার করে যে, মেয়েটি ছিলো খারাপ মেয়ে, বেশ্যা। যেন ‘বেশ্যা’ লেবাস লাগাতে পারলেই পুরুষদের খুন-ধর্ষন সকলি বৈধতা পেয়ে যায়! তাসলিমার ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর পাতায় আসলে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত পুলিশগুলোর ভূমিকা নিয়েছিল সৈয়দ হক, সুনীল, সমরেশ, আর চ্যালা-চামুন্ডা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর দল। কবি অসীম সাহা একটি সুন্দর কবিতার মাধ্যমে প্রথম আলো ঈদ সংখ্যায় খুলে দিয়েছিলেন এই ‘প্রগতিশীলতার মুখোশ’ :

মুখগুলো থেকে মুখোশ পড়েছে খসে
সাহসী মেয়েটি ছিটিয়ে দিয়েছে থু থু
ক্রোধের আগুনে সে তো আছে একা বসে
গোপন অঙ্গে লেগে আছে কাতুকুতু
প্রগতির স্রোতে যারা তুলে আছে পাল
প্রতিক্রিয়ায় তারাই পড়েছে বাধা
বক সন্ন্যাসী পরে আছে বাঘছাল
উজান ঠেকাতে তারাই রয়েছে বাধা ॥

মুখোশ : অসীম সাহা

ওলস্টোনক্র্যাফটের *ভিন্ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন* এর পর পাশ্চাত্য নারীবাদের ইতিহাসে ফরাসী দার্শনিক সিমন দ্য বোভায়ার *সেকেন্ড সেক্স* বা দ্বিতীয় লিঙ্গ (১৯৪৯) এবং কেইট মিলেটের *সেক্সুয়াল পলিটিক্স* বা লৈঙ্গিক রাজনীতি (১৯৬৯) দুটি অবিস্মরনীয় বই। নারীবাদকে জানতে হলে, নারীবাদের ইতিহাসটি বুঝতে চাইলে এই বইদুটি সম্পর্কে না জানলে চলবে না। এ ছাড়া পুরুষদের মধ্যে নারী-অধিকার বিষয়ে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক রচনাটি যার হাত দিয়ে এসেছে তিনি হলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, তাঁর লিখিত বইটির নাম *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৮৮৪), আর জন স্টুয়ার্ট মিল

উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে লেখেন *দি সাবজেকশন অব উইমেন* বা নারী-অধীনতা (১৮৬৯)। নারীবাদের আলোচনায় উল্লিখিত সবগুলো বইই আলাদাভাবে বিশ্লেষনের দাবী রাখে। এই পর্বে শুধু বোভায়ার অবদান আলোচিত হবে, বাকীদের অবদান পরবর্তী কোন আলোচনার জন্য তুলে রাখা হল।

বোভায়ার মতে নারীর যৌনতা নিজের থলিতে রেখেই পুরুষতন্ত্র সমাজে তার আধিপত্য বজায় রাখে, কিংবা রেখেছে চিরটা কাল। নারীর যৌনতার উপর তার নিজস্ব কোন অধিকারই রাখতে দেওয়া হয়নি। এই অধিকারহরণই হল পিতৃতন্ত্রের মোদ্দা কথা। বোভায়ার বলেন :

> পুরুষ যা ঘোষণা করে নারী তাই; আর তাই তাকে বলা হচ্ছে 'যৌনতা' যা দ্বারা এটাই বোঝায় যে নারী পুরুষের কাছে মূলতঃ যৌন সত্ত্বা। পুরুষের কাছে নারী হচ্ছে যৌনতা -বিশুদ্ধ যৌনতা, তার কম নয়। তাকে বর্ণনা ও আলাদা করা হয় পুরুষের সাথে তুলনা করে, পুরুষকে নারীর সঙ্গে তুলনা করে নয়; নারীই হচ্ছে আকস্মিক, অপরিহার্যের বিপরীতে অ-পরিহার্য, পুরুষই হচ্ছে বিষয়, পুরুষই পরম - নারী হচ্ছে দ্বিতীয়, অপর সত্তা, 'দ্য আদার'।

বোভায়ার সাত্রের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপন করেছেন নারীকে। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক। বিশ্বাসও করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে নারী তার অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু পরে নিজেই হতাশ হয়েছেন, সমাজতন্ত্রের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই, নারীর মুক্তির জন্য কাজ করতে হবে এখনই। ১৯৭২ সালে তিনি যোগ দেন নারীবাদী আন্দোলনে, প্রথমবারের মত সমাজতান্ত্রিক ঘরণা থেকে মুখ তুলে নিজেকে ঘোষনা করলেন নারীবাদী বলে। তিনি বলেন,

> 'দ্বিতীয় লিঙ্গের শেষ ভাগে বলেছিলাম আমি নারীবাদী নই, কেননা আমি বিশ্বাস করতাম যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাথে আপনা আপনি সমধান হয়ে যাবে নারীর সমস্যা। ... কিন্তু আজ এ-অর্থেই আমি নারীবাদী, কেননা আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার আগে নারীর পরিস্থিতির জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে, এখানে এবং এখনই।'

এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ অসামান্য কিছু কথামালা আমাদের উপহার দিয়েছেন তার *নারী* (১৯৯২) গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে শুধু নারীই শোষিত নয়, অধিকাংশ পুরুষও এখনো শৃঙ্খলিত ও শোষিত। তবে শোষিত শৃঙ্খলিত নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য : সব শ্রেনীর পুরুষ বন্দী ও শোষিত নয়, কিন্তু সব শ্রেণীর নারীই বন্দী ও শোষিত। নারী শোষণে বুর্জোয়া আর সর্বহারায় কোন পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেনীটিকে শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণীর নারীটিকেও; আর সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে তার নিজের শ্রেণীর নারীকে। বিত্তবান শ্রেণীর নারী পরগাছার পরগাছা, বিত্তহীন শ্রেণীর নারী দাসের দাসী। শোষণে সব শ্রেণীর পুরুষ অভিন্ন, শোষণে মিল রয়েছে মার্কিন কোটিপতির সাথে বিকলাংগ বাঙালি ভিখারীর, তারা উভয়েই পুরুষ, মানবপ্রজাতির রত্ন। আর নারীমাত্রই দ্বিগুন শোষিত।

এদিকে পাশ্চাত্যে নারীবাদীরা যখন প্রবলভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মগ্ন, তখন বাঙালি 'মহীষীরা' সেসময় তাদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন দীর্ঘদিনের লালিত ঘৃণা, আর উদ্বেলিত হয়ছেন তাদের নিজেদের কারাগারে অন্তরীণ 'গৃহলক্ষি' বন্দনায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ কখনই মেনে নিতে পারেননি পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীদের, তিনি ভেবেছেলেন ভারতীয় নারীরা পাশ্চাত্যের মেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল আছে, আর পাশ্চাত্যের 'নারী স্বাধীনতা' একটি ভ্রান্ত ধারণা । তিনি বলেন :

> আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধনহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই।

আরেক জায়গায় নারী আন্দোলনকে 'কোলাহল' বলে করেছেন বিদ্রুপ :

> আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।

'প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্বের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না' - এটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে মনের কথা, প্রাণের কথা। মেয়েদের তিনি দেখেছেন এভাবেই, গৃহদাসী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ আসলে রুশো-রাসকিন, টেনিসন আর দশটি ভিক্টোরীয় ও সমগ্র পুরুষতন্ত্রের মতো বিশ্বাস করতেন যে নারীপুরুষ সমকক্ষ নয়, নারী প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট প্রমাণ করতে তিনি বহু জায়গায় দোহাই পেরেছেন প্রকৃতির। যেমন, এক জায়গায় বলেছেন 'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না', আবার আরেক জায়গায় বলেছেন, 'স্ত্রী লোকের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে স্ত্রী শিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান একথা গায়ের জোরে তোলবার কোন দরকার নেই।' আবার কোথাও বা বলেছেন, 'পতিভক্তিই স্ত্রী-লেকের একমাত্র ধর্ম', আবার কোথাও মেয়েদের তুলনা করেছেন 'গৃহহাসীর' সাথে আর ভৃত্যের প্রভুভক্তির বন্দনা করে বলেছেন - এতে করে 'ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।'। এগুলো সবই জায়েজ করতে চেয়েছেন প্রকৃতিকে টেনে এনে। আসলে প্রকৃতির স্বর শোনা প্রথাবাদীদের স্বভাব, কেননা তাতে পুরুষতান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে কিংবা যুক্তি ও সত্যের বদলে উপস্থিত করা যায় অলৌকিক শক্তিকে, এবং সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় শোষিতদের উপরে। কখনও কখনও 'বিদ্রোহী' নারী তৈরী করে নিজেকে 'প্রগতিশীল' বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টি করেছেন চিত্রাঙ্গদা, লাবন্য (শেষের কবিতা) অথবা বিমলার (ঘরে বাইরে) মত সাহসী চরিত্র। কিন্তু 'বেসরম' আর 'বেয়াদপ' চরিত্রগুলোকে পুনরায় পুরুষদের গড়ে দেওয়া ছকে ফিরিয়ে এনে তাদের 'উদ্ধার' করেছেন। ছক-ভাঙা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করার সফল উদাহরণ *চিত্রাঙ্গদা* (১২৯৯ বাং)। এতে প্রমাণ করা হয়েছে নারী যতই সাহসী হোক না কেন, নিজ প্রতিভায় স্বাধীন ও সায়ত্তশাসিত হবার অযোগ্য; সে হতে পারে বড়জোর পুরুষের সহচরী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা আমাদের মনে করিয়ে দেয় টেনিসনের *প্রিন্সেস*কে (১৮৪৭), যাতে উঠে এসেছিলো এক বিদ্রোহী নারীকে শেষ পর্যন্ত স্বামীর সেবিকা বানিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার মধুরতম ভিক্টোরীয় রূপ। ঘরে বাইরে উপন্যাসেও 'পথভ্রষ্ট' বিমলাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রায়শ্চিত্ত করাননি, তার মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন সতীত্বের মহিমা। ডঃ হুমায়ুন আজাদ খুব সঠিকভাবেই রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়ন করেছেন, আর তাঁর স্ববিরোধিতাগুলো তার নারী গ্রন্থে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তার অসামান্য মূল্যায়নটি 'রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী' শিরোনামে মুক্তমনায় রাখা আছে। ডঃ আজাদ সেখানে যথার্থই বলেছেন - 'রবীন্দ্রনাথ, যাকে মনে করা হয় নিজের সময়ের থেকে অনেক অগ্রসর, আসলে পিছিয়ে ছিলেন নিজের সময়ের চেয়ে হাজার বছর'।

আসলে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সকলেই সেসময় নারীকে পুরুষদের সমকক্ষ হবার চেয়ে তাদের গৃহে অন্তরীণ দেখতেই পছন্দ করতেন বেশী। যেমন, জগদীশ্বরী দেবী যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, তার *দ্রৌপদী* কাব্য সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :

> 'গ্রন্থকত্রী যদি কাব্যশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধণশালার ভার গ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে - সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।'

নারীর কাজ যে কেবল রান্না করা, সাহিত্য চর্চা নয় তা সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়েও ভুলতে পারেননি দীনেশচন্দ্র। এধরণের উদাহরণ হাজির করা যায় বহু। যে শরৎচন্দ্র নারীর পক্ষে একসময় লিখেছিলেন এক মহামূল্যবান গ্রন্থ *'নারীর মূল্য'*, সেই শরৎচন্দ্রই 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে লিখেন একটি হীন ও প্রবল নারী-বিদ্বেষী প্রবন্ধ -*নারীর লেখা*। সে প্রবন্ধে তিনি উপহাস করেন নারীদের মেধা, মনন আর সৃষ্টিশীলতাকে। সাহিত্যচর্চা বাদ দিয়ে পুনরায় 'পাক-ঘরে' পাঠতে প্রলুব্ধ করেন আমোদিনী, নিরুপমা দেবীর মত সাহিত্যিকদের। নারীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থেকে নারীদের আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের জয়ন্তী উৎসব পালন করা পুরুষদের এক অতি হীন 'পুংগর্বী' স্বভাব। এ ধরণের কাজ শরৎচন্দ্র তো করেছেনই, করেছেন আরো অনেকেই।

বাংলা উপন্যাসুগলোর বড় অংশ রচিত হয়েছে আসলে পুরুষের হাত দিয়ে, ফলে নারীর ব্যক্তিত্ব ও লৈঙ্গিক ভূমিকা সেখানে পুরুষতন্ত্র কর্তৃক বেঁধে দেওয়া কতকগুলো ছকের সমষ্টি, যে ছক বাঙালী নারীর জন্য মূলতঃ তিনটি ভাবমূর্তি কল্পনা করেছে। এই ছক শেখায় নারী কখনই মানুষ নয়; সে হয় 'সর্বংসহা' জননী, নয়ত 'পতি অনুগতা' ভার্যা কিংবা 'লাস্যময়ী' বিনোদিনী। তবে শেষোক্ত লাস্যময়ী বিনোদিনীটি পুরুষের 'লীলা খেলার' জন্য উদ্দিষ্ট থাকলেও, সতী সাধ্বী, পতিভক্ত স্ত্রীর মতো গৌরবান্বিত নয়; সে স্বৈরণী, এক লেলিহান কামকুন্ড। বাঙলা উপন্যাসে সাধারণতঃ এ ধরণের পাপিস্ঠা স্বৈরণীকে বশ করার মাধ্যমেই রচিত হয় পুরুষতন্ত্রের জয়গান। আসলে রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে বঙ্কিম, বঙ্কিম থেকে বিভূতিভূষণ সকলেই নারীর এই ত্রিমাত্রিক ছকেই ঘুরপাক খেয়েছেন, আর নারীদের শেখাতে চেয়েছেন সেই চিরন্তন সতীত্ব, আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর মর্ষকামিতার হোমশিখা। পতিপ্রভুর প্রতি তাঁর বাঁদীর সকৃতজ্ঞ ভক্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে *মনোয়ারা* , যেখানে বলা হয়েছে:

> 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীসেবা। ঐ স্বামীসেবার মধ্যেই নারীর ইহকাল ও পরকাল। তাহার সুখ শান্তি কামনা বাসনা - ঐ এক পতিসেবার মধ্যে নিবদ্ধ। নারীর পতিই ধর্ম, পতিই কর্ম-পতিই তাহার সর্বস্ব। পতিরত্ন হতে যে নারী বঞ্চিতা, সে নারী অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য সাধন ও পরিপূর্ণভাবে ধর্মবিধি প্রতিপালন করিতে হইলে বিবাহ করা নারী জাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য।'

রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র সকলেই যখন পতি অনুগতা, আত্মত্যাগী সতী ভার্যা ভাবমূর্তির স্তব করে গেছেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে, তখন বেগম রোকেয়া ১৯০৪ সালে আমাদের উপহার দিলেন এক বিপ্লবী প্রবন্ধ - 'আমাদের অবনতি'। এ প্রবন্ধটি পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় 'স্ত্রী জাতির অবনতি' নামে। এপ্রবন্ধেই ভারতবর্ষে প্রথমবারের মত ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে পেশ করা হয় তীব্র নারীবাদী বক্তব্য। রোকেয়া বলেন :

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমরা প্রথমতঃ যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগন ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে

ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।’

রোকেয়ার লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাশ্চাত্যের স্ট্যান্টনকে যিনি পাঁজরের হার থেকে নারী জন্মের উপাখ্যানকে শ্রেফ রূপকথা বলে ঘোষণা করে অবশেষে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন পুরো বাইবেলটিকেই। কারণ পুরো বাইবেলটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ইভ-এর পাপের উপর তৈরী হয়ে। স্ট্যান্টন এবং রোকেয়া দুজনের বক্তব্যেই প্রথাবাদীরা চীৎকার করে ওঠে যার যার মত। রক্ষণশীলদের উন্মত্ততায় রোকেয়া শেষ পর্যন্ত ধর্মবিদ্বেষী ‘আপত্তিকর অংশ’গুলো বাদ দিতে বাধ্য হন। ডঃ হুমায়ুন আজাদের মতে, ওই আপত্তিকর নিষিদ্ধ অংশটুকুই রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ রচনা। নারীবাদের ইতিহাসে রোকেয়া একটি অনন্য নাম হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বলতে হয়, রোকেয়ার মধ্যে স্ব-বিরোধ ছিলো বিস্তর, চোখে পড়ার মতই। পর্দা প্রথার পক্ষে রোকেয়ার স্ব-বিরোধী বক্তব্য এবং এর জাঁকালো ব্যাখ্যা তার প্রমাণ :

> ‘প্রয়োজন হইলে অবগুন্ঠন সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না।’

আসলে এ ধরনের ‘পর্দানসীন ভদ্রবেশী নারী’ যিনি কিনা মাঝে মাঝে উচ্চকিত হবেন নারীমুক্তির বন্দনায়, কিন্তু নিশি-দিন যাপন করে যাবেন এক প্রথাগ্রস্ত, বিনীত, মান্য করে ধন্য হয়ে যাওয়া ছকে বাঁধা জীবন - এমন ‘অধুনিকা’ নারীরূপ কিন্তু পুরুষতন্ত্রের খুব পছন্দের। রোকেয়া তসলিমা বা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের মত উগ্র, ঝাঁঝালো, আমূল নারীবাদী নন; তিনি বাঙালী মুসলমান নারী জাগরণের জন্য লিখে গেছেন কিছু অমূল্য রচনা, কিন্তু নিজের জীবনে অনড় করে রেখেছিলেন অন্ধকার, বোরখা ও প্রথার মহিমা। যেহেতু তিনি তুস্ট করেন পুরুষতন্ত্রের ‘উদারনৈতিক’ সকল চাহিদা, তাই বিনিময়ে পুরুষতন্ত্র আজ তাকে দিয়েছে ‘মহীয়সী’ অভিধা, এখন নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ‘নারী জাগরনের অগ্রদূত’ হিসেবে। আজ তাই দেখা যায় এমনকি চরম রক্ষণশীল, প্রথাগ্রস্ত পুরুষটিকেও রোকেয়া বন্দনায় মুখর হতে। আসলে এভাবে পুরুষতন্ত্র পালন করে তার দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা সাম্রাজ্য আর ছকের জয়ন্তী উৎসব। তাই ডঃ আকিমুন রহমান যথার্থই বলেছেন :

> ‘রোকেয়া শেকল মুক্তির লড়াইয়ে লড়াকু মানুষ নন, যদিও তাঁর রচনাবলী পাঠে জাগে অমনি বিভ্রম। রোকেয়া পাথর চাপা ঘাস বা স্বামীর ছাঁচে বিকশিত এক পরিতৃপ্ত বেগম, এখন নারী মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে পেয়েছে ভুল প্রসিদ্ধি।’

সম্ভবতঃ আরেকজন ব্যতিক্রম ছিলেন; তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। আজকে যে পতিতাদের আধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে দেশ-বিদেশীর অসংখ্য নারীবাদী আর মানবতাবাদীরা, সোচ্চারে বলছে যে, পতিতাদের ‘পতিতা’ বলা যাবে না, দিতে হবে যৌনকর্মীর সম্মান, সেগুলো কিন্তু নজরুল আশি বছর আগেই বলে গেছেন পরিস্কার ভাবে :

> ‘কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থথু ও গায়ে
> হয়তো তোমাকে স্তন্য দিয়েছে সীতা সম সতী মায়ে।...’

সভ্যতার ক্রমবিকাশকে শুধু পুরুষদের একার অবদান দিসেবে দেখেননি নজরুল, নারী (১৯২৫) কবিতায় স্পষ্টকথায় বলেছেন সেটি :

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

যেখানে সে সময় অধিকাংশ সাহিত্যকেরা নারীদের দেখতে চেয়েছেন 'গৃহ-লক্ষী' হিসেবে, দাসী হিসেবে সেখানে নজরুল শুনিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তিনি চেয়েছেন, নারীদের শোষন মুক্তি, চেয়েছেন নারী-পুরুষের বিশুদ্ধ সাম্য :

'সাম্যের গান গাই -
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!'

নারীপুরুষ সমান, তাদের অধিকার অভিন্ন : এ বিশুদ্ধ সাম্যই হচ্ছে শেষপর্যন্ত নারীবাদের মূলকথা। এধরণের বলিষ্ঠ উচ্চারণ নজরুলের মধ্যে প্রবলভাবেই পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে পাওয়া যায় না, যেটি ছিল আমাদের জন্য পরমভাবেই কাঙ্খিত।

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দি কাহারো, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।

চলবে

তথ্যসূত্র :

পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, আষাঢ় ১৩৩৫, কলিকাতা
যৌনতা ও সংস্কৃতি, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ডিসেম্বর ২০০২, কলিকাতা
নারী, হুমায়ুন আজাদ, ডিসেম্বর ২০০৪, বাংলাদেশ
বিবি থেকে বেগম : বাঙালি নারীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, আকিমুন রহমান, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ঢাকা
তসলিমার ক : পান্ডুলিপি পোড়ে না, রোবায়েত ফেরদৌস সম্পাদিত, মার্চ ২০০৪, বাংলাদেশ।
নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, তসলিমা নাসরিন।
নির্বাচিত কলাম, তসলিমা নাসরিন।
The subjection of Women, John Stuart Mill, 3rd ed.1870
Sexual Politics, Kate Millet, Reprinted 1972
Vindication of the Rights of Women, Marry Wollstonecraft, Reprinted 1983
A Room of One's Own, Virginia Wolf, 13th Impression, 1959